122

দৈনিক বাংলা

এসএসসি পরীক্ষার নানা সমস্যা—

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের টেস্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের নির্বাচিত হবার পালা। প্রায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সবকিছু শেষ করতে হবে। পরীক্ষার্থী নির্বাচন, ফি গ্রহণ ও ফরম পূরণের কাজ শুরু করতে হবে। কিন্তু ইচ্ছা হলেই এবার সব কিছু সহজ হচ্ছে না।

শিক্ষাবোর্ডের সর্বশেষ সার্কুলারে বলা হয়েছে—টেস্টে যারা সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরই পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করতে হবে। প্রস্তাব উত্তম। কিন্তু বাস্তব দিকটি ভিন্ন ধরনের। আমার কাছে একটি স্কুলের খবর আছে। গত এসএসসি পরীক্ষায় সেই স্কুল থেকে শতকরা ৮০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। সেই স্কুলে এবার টেস্টে পরীক্ষা দিয়েছে ১৫ জন। তার মধ্যে পাস করেছে ১ জন। বোর্ডের সার্কুলার মানতে হলে ঐ স্কুলে একজন ছাত্রকেই নির্বাচিত করতে হবে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য।

অপর একটি স্কুল এক জেলা শহরে। সেই স্কুলটির নাম-ডাক আছে। পরীক্ষায় প্রতিবছর ভাল ফল করে। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ১৮৬ জনের মধ্যে সব বিষয়ে পাস করেছে মাত্র ২ জন। বোর্ডের সার্কুলার মানতে হলে ১৮৪ জনকেই বাদ দিতে হবে।

কিন্তু কেন এমন হয়? বরাবর কি এমন ঘটনাই ঘটে? নাকি এবারই ঘটছে? এই প্রশ্নেরও একটা জবাব আছে। জবাব হচ্ছে— ১৯৯২ সালের পর ১৯৯৬ সাল থেকে নতুন ধরনের পরীক্ষা হচ্ছে। প্রশ্ন ব্যাংক থাকছে না। প্রতি বিষয়ের প্রতিটি পত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে পাস করতে হবে। গত বছর পর্যন্ত ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক ছিল। প্রতিটি বিষয়ের উভয় পত্র মিলেই পাশের মার্ক নির্ধারিত হত। অধিকাংশ শিক্ষকের ধারণা নতুন পদ্ধতি চালু হবার ফলে এবারের টেস্ট পরীক্ষারই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

অন্য শিক্ষকদের আবার ভিন্ন মত আছে। তারা বলছেন, কোন কালেই টেস্টে যারা সকল বিষয়ে পাস করেছে শুধু মাত্র তাদেরই পরীক্ষা দিতে দেয়া হত এ তথ্য সত্য নয়। বেসরকারী স্কুলে সাধারণত অল্প সংখ্যক ছাত্রই সব বিষয়ে পাস করত। টেস্ট পরীক্ষায় এ্যালাউ হওয়ার পরে তারা নতুন করে পড়তে শুরু করত। নিজের উদ্যোগে ও শিক্ষকের সহযোগিতায় মোটামুটিভাবে পাস করে যেত, অনেকে ভাল ফলও করত। সরকারী স্কুলে ভিন্ন নিয়ম থাকলেও এভাবেই বেসরকারী স্কুলের পরীক্ষার্থী নির্বাচিত হত। এজন্য ভাগ করা হত প্রথম কল, দ্বিতীয় কল ও তৃতীয় কল হিসাবে। যারা সব বিষয়ে পাস করত তারা প্রথম কল, যারা এক বিষয়ে ফেল করত তারা দ্বিতীয় কল, যারা দুই বিষয়ে ফেল করত তারা তৃতীয় কল-এ নির্বাচিত হত। এতে ছাত্রদের কিছু বেশী পয়সা খরচ হত। কিন্তু পরীক্ষা দিতে কোন অসুবিধা হত না। শিক্ষাবোর্ডের নতুন নির্দেশের ফলে এই পদ্ধতি আর মানা চলছে না। তাহলে কি হবে— এই প্রশ্নই এখন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচিত হচ্ছে। এই সমস্যা সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অবহিত হয়েছেন এবং নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া না হলে জেনে শুনে প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের মিথ্যাচার করতে হবে পরীক্ষার্থীর নির্বাচন নিয়ে। কোন স্কুল নিশ্চয় ২, ৩, বা ৫ জন ছাত্র পাঠাবে না বোর্ডের সার্কুলার মেনে নিয়ে। তাই এই কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঠিক এমন একটি সিদ্ধান্তই নিতে হবে ছাত্রীদের উপবৃত্তি নিয়ে। এ বছর থেকে স্কুলের সকল ছাত্রীরাই উপবৃত্তি পাবে। নবম শ্রেণীর ছাত্রীরা পাবে প্রতি মাসে ৪৫ টাকা এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা পাবে প্রতিমাসে ৬০ টাকা। তবে এ ব্যাপারেও শর্ত আছে। শর্ত হচ্ছে অবিবাহিত ছাত্রী হতে হবে, শতকরা ৭৫ দিন স্কুলে উপস্থিত হতে হবে, পরীক্ষায় গড়ে ৪৫ মার্ক পেতে হবে। এ শর্ত অনুযায়ী বিবাহিত ছাত্রীরা বৃত্তি পায় না। কিন্তু পরবর্তী দুটি শর্ত মানান খুব কঠিন। অভিভাবকদের চাপে এই ছাত্রীদের উপরের ক্লাসে প্রমোশন দিতে হয়। এদের বিরুদ্ধে কিছুই লেখা চলে না। বিপদ হয় এসএসসি পরীক্ষার সময়। যারা গড়ে শতকরা ৪৫ নম্বর পেয়ে নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় তাদের ঐ সুবাদেই আবার টেস্টে এ্যালাউ করতে হয়। কিন্তু তারা যে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করবে তার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। আবার বোর্ড থেকে আইন করা হয়েছে কোন স্কুলের পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের পাসের হারের শতকরা ৬০ ভাগ পাস না করলে স্কুলের সাহায্য কেটে দেয়া হবে। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়েছে বিপাকে। এই বিপাক থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন। তাই মনে হয় উপবৃত্তির শর্তসহ সব ব্যাপারটাই নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

তিন নম্বর সমস্যা হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে। পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ প্রতি ছাত্র প্রতি ১০০ টাকা। কিন্তু ঐ ১০০ টাকায় ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। এর পরেও পরীক্ষার কারণে শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকায় যাতায়াত করতে হয়। প্রশ্নপত্র আনা-নেয়া করতে হয়। এ ব্যাপারে কোন টাকাই বরাদ্দ নেই বোর্ডের সার্কুলারে। বোর্ড পরীক্ষার ফি-এর অংকের তালিকা সংবাদপত্রে ছেপে দেন। তাতে বিশেষ ব্যয়ের কোন কথা থাকে না। আর এই ব্যয়ের নামেই প্রতিটি স্কুলে বাড়তি টাকা দাবী করা হয় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে। ফলে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা মনে করে স্কুল কর্তৃপক্ষ টাকা মেরে দিচ্ছে। বেআইনীভাবে টাকা নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এ অপ্রিয় সত্যটি বোর্ডের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু কোন কাজেই আসছে না। ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে স্কুলে স্কুলে ফি দাখিল ও ফরম পূরণ নিয়ে।

— নির্মল সেন